Avjvn ZvAvjvi cwiPq

[□□□□□□]

الله جل جلاله

[اللغة البنغالية]

‡jLK : nv‡dh †bQvi DwÏb

تأليف: حافظ نثار الدين

m¤úv`bv : KvDmvi web Lv‡j`

مراجعة : كوثر بن خالد

Bmjvg cÖPvi ey¨‡iv, iveIqvn, wiqv`

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 1)
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
প্রোফেসর সাহেবের ইউনিভারসিটি পড়ুয়া মেয়ে টেবিলে বাবার জন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছেন ঘণ্টা দেড়েক থেকে। প্রতিদিনের মতো আজও বাবার সাথে খাবে-এ আশায় অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ থেকেই। কই! বাবা যে আসছে না এখনও। বারবার হাতঘড়ির প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে আর বারান্দায় পায়চারি করছে প্রোফেসর সাহেবের একমাত্র মেয়ে অনার্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী। পরীক্ষাও খুব কাছে এসে গেছে তার। খাওয়া শেষ করে পড়তে বসবে। হঠাৎ বাবার ফিরতে দেরি হওয়া অস্থিরতার কারণ হলো। খাওয়ার টেবিলে প্রতিদিনই নানা কথা হয় বাবা-মেয়ের মাঝে। মেয়ের কিশোর বয়সেই মা পৃথক হয়ে চলে গেছে অন্যত্র বিয়ে বসে। বাড়িতে বাপ মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ নেই। হঠাৎ বারান্দা থেকেই দেখা গেল বাবা আসছেন। মলিন চেহারা, উসকো-খুসকো মাথার সাদা চুল। অবসাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে সারা মুখমণ্ডলে। অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট সারা অবয়বে। আঁৎকে উঠে বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে।
কি হয়েছে বাবা? তোমার এ অবস্থা কেন? কারো সাথে ঝগড়া হয়েছে, না অন্য কোন সমস্যা? প্রোফেসর সাহেব মুখ খুলছেন না। বলেন, না কিছুই হয়নি মা, আমি ঠিকই আছি। কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, তোমাকে বলতেই হবে। বাবা, আমি জানতে চাই তুমি কেন আপসেট। মেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হন প্রোফেসর ইমতিয়াজ। তিনি বলেন, লোকেরা নানা প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করে দিয়েছে আজ। সারা জীবন যে মতবাদ প্রচার করেছি, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করে এসেছি, ক্লাসে, লেখায় ও বক্তৃতায় দীর্ঘদিন শিক্ষা দিয়ে আসলাম। এখন এ চিন্তাধারা ভুল প্রমাণ করে আমাকে নাজেহাল করল তারা। আমি বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এলাম ফিলোজফির ক্লাস থেকে। শুনে মেয়ে বলল, বাবা, তুমি এভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে? তোমার পূর্বে যারা এ চিন্তাধারার সূচনা করেছে, তাদের কথা স্মরণ কর।
সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই। সবকিছু প্রকৃতি-এটা প্রচার করতে তাদেরকেও হিমশিম খেতে হয়েছিল। কিন্তু যতই যুক্তি- প্রমাণ আসতো, তাদের কথা ছিল একটিই। কোন যুক্তিতর্ক নেই। যা বলা হচ্ছে, তাই একমাত্র সত্য, এটাই মানতে হবে। এককথার উপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে হবে। বাবা, প্লেটো, ডারউইন, কাল মার্কস-ইত্যাদি বড় বড় নামকরা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকরা এমনই বলত। সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই। এটা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ঠেকানো যাবে না- কোনকালেও। তারপরও বলে যেতো সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে। এটাই হচ্ছে মূলত নাস্তিকদের একমাত্র অস্ত্র। যুক্তিতর্কের ধার তারা ধারে না। তারা এবং তাদের গুরুরা মূলত: এভাবেই প্রচার করতো নাস্তিকতাবাদ। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এসকল অথর্ব বোকা ও অর্বাচীনদের জন্য কিছু আলোচনা করব অতি সংক্ষিপ্তভাবে। পাঠকদের অনুরোধ

করব এদের হাতে বইটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যা তাদের আখেরাতের পাথেয় হিসাবে কাজে লাগবে।
ভূমিকা
মানব ইতিহাসের কোন স্তরেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কখনও কোন সন্দেহ করেনি, করার প্রশ্নও আসেনি। কোন বিবেকবান মানুষ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবী অতীতে কল্পনাও করতে পারেনি এ ধরনের চিন্তাধারার। প্রকৃতির প্রতিটি নিদর্শন, আর সৃষ্টির প্রতিটি পত্র-পল্লব যখন তাদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কথা চিৎকার করে ঘোষণা করছে. তখন মানুষ নামী একদল অনুভূতিহীন গোষ্ঠী বলে বেড়াচ্ছে যে, সবকিছু আপনা-আপনিতে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। কেউ এসব সৃষ্টি করেনি। অন্যকথায়, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই, কিছু নেই। বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় যে এদেরকে আবার সমাজের কিছু লোক দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এসব তথাকথিত লোকদের যুক্তি ও তথ্যসমূহ খুবই হাস্যকর। দর্শনের নামে কতগুলো উদ্ভট তথ্য তারা সমাজে প্রচার করে যাচ্ছে। আধুনিক যুগে খ্রিস্টান ধর্ম-যাজকদের একক সৃষ্টিকর্তার বদলে ত্রিত্ববাদ অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিরুদ্ধে গোঁড়ামিসূচক আচরণ দ্বারা পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠার কারণে গোটা পাশ্চাত্য সমাজ এ-ভ্রান্ত ও খুবই অযৌক্তিক মতবাদটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এ সুযোগে একদল দার্শনিক অমূলক যুক্তি প্রদর্শন করে সেক্যুলার মিডিয়ার মাধ্যমে অবিরামভাবে জগৎব্যাপী প্রচার করতে সক্ষম হয়। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত তথাকথিত দার্শনিকদের সেসব যুক্তিকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপের পরিবর্তে আরও যুক্তির দাবি আসতে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। প্রসিদ্ধি লাভের জন্য এসব তথাকথিত দার্শনিকগণ এভাবে অরও উৎসাহী হয়ে উঠে। জগৎবাসী তাদেরকে ঘাড় ধরে জিজ্ঞেস করেনি যে, ঘর থাকলে নির্মাতা থাকবে, কুড়াল থাকলে কামার থাকবে, নৌকা থাকলে কাঠ-মিস্ত্রি থাকবে, তাহলে কেন এ বিশাল জগৎটির সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না? অথচ মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তি ছাড়া, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও জানে যে, একটি ঘরের জন্য নির্মাতা, কুড়ালের জন্য কামার, গাড়ির জন্য ইঞ্জিনিয়ার যেমন অপরিহার্য, তেমনি এ বিশাল বিশ্ব-ব্যবস্থা সৃষ্টির পিছনে রয়েছেন মহান শক্তিশালী ও সুদক্ষ একজন কারিগর। আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এ ধরনের অসংখ্য নিদর্শন সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ হিসাবে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমরা এ জগতের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ও অতি সাধারণ সামান্য জিনিসগুলো সম্পর্কেও বিশ্বাস রাখি যে, এসব কিছুর পিছনে একজন কারিগর রয়েছেন। এটা অস্বীকার করাকে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা ও গোঁয়ারতুমি ধরে নেয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এ বিশাল জগতের সৃষ্টি রহস্যের পেছনে সর্বশক্তিমান ও বিচক্ষণ সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যারা সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে যাচ্ছে,

তাদেরকে এ যুগে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক-বিরাট দার্শনিক হিসাবে।
মূলত: অষ্টাদশ শতাব্দীতেই তথাকথিত বিবর্তনবাদের প্রবর্তক ডারউইন এবং কমিউনিজমের উদ্ভাবক কাল মার্কস এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ধারণা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করেন পাশ্চাত্যের খ্রিস্ট মতবাদের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসীদের মাঝে, যা তাওহীদবাদী যুক্তি ভিত্তিক ইসলামের মোকাবিলায় টিকতেই পারে না। এদেরই অনুসারীরা অন্ধবিশ্বাসের ন্যায় এ মতবাদেও স্বপক্ষে ওকালতি করে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের কিছু অনুচর রয়েছে, যারা ধর্মহীন উচ্ছৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ডারউইন ও কাল মার্কস-এর উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত।
সম্প্রতি বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুক্ত-বুদ্ধির দাবিদার কিছু কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর মাঝে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার সত্তাকে অস্বীকার করা আজকাল যেন একটা ফ্যাশানে পরিণত হতে চলেছে। মানুষ নামী এসব জীবগুলোকে আশরাফুল মখলুকাত এর উচ্চাসনে ফিরিয়ে আনার একটা প্রয়াসের প্রয়োজন অনেকদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছে। আলাপ-আলোচনা আর তর্কবিতর্কের পরিবেশ দেশে অনুপস্থিত থাকায় লেখা বা প্রকাশনার মাধ্যমে এ কাজ সহজেই করা যায় বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।
যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদির মাধ্যমে তাদেরই পদ্ধতিতে বইটি প্রকাশের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। পাঠক সমাজের নিকট পকেট সাইজ এ বইটি সমাদৃত হলে আমাদের সাধনা সার্থক হবে বলে মনে করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ তৃণসম প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এটাই কামনা করছি। আমিন।
আল্লাহর পরিচয়
আল্লাহ একটি আরবি শব্দ। এ শব্দটি এমন এক সত্তার জন্যে নির্ধারিত, যিনি অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অধিকারী, যিনি যাবতীয় পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার গুণাবলিতে ভূষিত এবং সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা, অপবিত্রতা ও যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। সর্বোপরি যিনি এসব গুণাবলির একমাত্র অধিকারী। অর্থাৎ, যিনি ব্যতীত এসব গুণাবলির অধিকারী অপর কেউই নেই, তিনিই হলেন আল্লাহ। সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও শক্তির একক আধার।
আল্লাহ ছাড়া এরূপ মর্যাদায় মর্যাদাবান আর কেউ নেই। এক্ষেত্রে তিনি একক, অনন্য। তার সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউ নেই এবং থাকতে পারে না। তিনি তার সত্তা, গুণাবলি ও কার্যাবলির ব্যাপারে এক কথায় সর্বদিক থেকে একক, অনন্য ও অদ্বিতীয়। তাই তিনি থেকে যেমন পবিত্র, তেমনি মুক্ত ও পবিত্র সৃষ্টির সাথে যাবতীয় সাদৃশ্যতা থেকে। বিশ্বজগতের তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই একমাত্র অবশ্যম্ভাবী সত্তা (ওয়াজিবুল ওজুদ)। যাবতীয়

[illegible]

[illegible]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَـا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْـفَعُ عِنْـدَهُ إِلَّا بِإِذْنِـهِ يَعْلَمُ مَـا بَيْنَ أَيْـدِيهِمْ وَمَـا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِـيُّهُ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. (البقرة : 254)

[illegible]

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ الَّذِي خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَـلْ تَـرَى مِنْ فُطُـورٍ ثُمَّ ارْجِـعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. (الملك: 1-4)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চালিয়ে থাকে। তারা বলে আল্লাহকে কেউ দেখে না, ধর্মের ধ্বজাধারীরা সাধারণ মানুষকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর একটা ধারণা প্রসূত মতবাদ দাঁড় করানোর জন্য অদেখা-অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে মনগড়া কথাবার্তা চালু করে রেখেছে। জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা এখন আর অসম্ভব নয় বলে অবৈজ্ঞানিক অস্পষ্ট চিন্তাধারার বিশ্বাস করারও কোন প্রয়োজন নেই। ভীতি প্রদর্শনের জন্য পরকালের কঠোর আজাবের কথা আর ভোগ লালসার আশ্বাসবাণীর জন্য স্বর্গ-এগুলো ধর্মেরই তৈরি, যার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভাব করা যায় না, তা কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে? আল্লাহ নামক এই ধারণা মানুষেরই সৃষ্টি। মূলত: আল্লাহ বলতে কিছু নেই।
নাস্তিকদের মোটামুটি যুক্তিগুলো এ ধরনেরই। এসব কথাকেই নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে তারা পেশ করার চেষ্টা করে। অথচ তারাই আবার এমন সব জিনিস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না-যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত অনুভাব করি ও বিশ্বাস করি। অদেখা হাজারো জিনিস আমরা প্রতিনিয়ত অনুভাব করে, না দেখে বিশ্বাস করি। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। দেয়ালের অপর পাশে কি আছে, তা দেখার শক্তি আমাদের নেই। ধুয়ার কুণ্ডলী দেখলেই আমরা বুঝতে পারি পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুনের লেলিহান শিখা কিন্তু আমরা দেখিনি, দেখেছি তার নিদর্শন। তাতেই আমাদের বিশ্বাস হয়েছে-ওখানে অবশ্যই আগুন আছে। তখন কিন্তু আমরা যুক্তি দিতে চেষ্টা করি না যে, না, আগুনতো দেখা যাচ্ছে না। তাই বিশ্বাসও করব না। এ যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইলেক্ট্রনিক, ইথর, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন-আরো অনেক জিনিস আমরা শুধু নিদর্শন দেখেই বিশ্বাস করে থাকি। রেডিওর আওয়াজ, বিদ্যুতের আলো আর শ্বাস-প্রশ্বাসের নির্গত ও বহির্গত বায়ুও আমরা দেখি না, শুধু অনুভব করি। কেউ কি বলতে পারে যে এসব অদৃশ্য কথাবার্তায় আমরা বিশ্বাস করব না। এগুলো আমাদের দেখতে হবে। তবেই মাত্র বিশ্বাস করা যাবে। এ ছাড়াও বলা যায়, আগামী কিছুদিন পরই আরম্ভ হচ্ছে ২০০০ সালের বর্ষ বরণ উৎসব। তা শুনে আমরা সবাই বিশ্বাস করেছি। এটা কেন বলা হচ্ছে না যে- ২০০০ সাল আসুক, উৎসব হক, তারপর বিশ্বাস করব-এখন না দেখে কীভাবে বিশ্বাস করব? ক্রুজ মিসাইল আমরা দেখি না। কিন্তু আছে, তা বিশ্বাস করি। এখানে এ প্রশ্ন করি না কেন-দেখি না তাই বিশ্বাসও করব না। তাহলে স্রষ্টার এ বিশাল জগৎটা এত সুন্দর ও সুবিন্যস্ত আর সুশৃঙ্খল দেখেও কেন আমরা তাঁর শক্তিধর সূক্ষ্ম কারিগর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করব? আহম্মকী-বোকামি আর বিকৃতিরও একটা সীমা আছে।
মানুষ ব্রেনের করণেই সৃষ্টির সেরা জিব-আশরাফুল মখলুকাত। কিন্তু এ ব্রেন থাকা সত্ত্বেও এর অপব্যবহার করে সে যদি নিজেকে গরু-ভেড়া আর ছাগলের স্তরে নামিয়ে পশুর লাইনে দাঁড়াতে চায় তাহলে কে তাকে রক্ষা করতে পারে! এসব বিকৃতমনা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকরা মূলত: নিজেরাই নিজেদের জন্তু

[illegible]

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (البقرة :7)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الأعراف: 179)

[illegible]

ওয়েব গ্রন্থনা: আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার /সার্বিক যত্ন: আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।

Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 2)
কুফরের সংজ্ঞা
(ইসলাম পরিচিতি বই থেকে নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত হল)
যে মানুষের কথা উপরে বলা হলো, তার মোকাবিলায় রয়েছে আর এক শ্রেণির মানুষ। সে মুসলিম হয়েই পয়দা হয়েছে এবং না জেনে, না বুঝে জীবনভর মুসলিম হয়েই থেকেছে। কিন্তু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহকে চেনেনি এবং নিজের নির্বাচন ক্ষমতার সীমানার মধ্যে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের লোক হচ্ছে কাফের। কুফর শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ঢেকে রাখা বা গোপন করা। এ ধরনের লোককে কাফের (গোপনকারী) বলা হয়, কারণ সে তার আপন স্বভাবের উপর ফেলেছে অজ্ঞতার পরদা। সে পয়দা হয়েছে ইসলামি স্বভাব নিয়ে। তার সারা দেহ ও দেহের প্রতিটি অঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামি স্বভাবের উপর। তার পারিপার্শ্বিক সারা দুনিয়া চলছে ইসলামের পথ ধরে। কিন্তু তার বুদ্ধির উপর পড়েছে পরদা। সারা দুনিয়ার এবং তার নিজের সহজাত প্রকৃতি সরে গেছে তার দৃষ্টি থেকে। সে এ প্রকৃতির বিপরীত চিন্তা করেছে। তার বিপরীতমুখী হয়ে চলবার চেষ্টা করেছে। এখন বুঝা গেল, যে মানুষ কাফের, সে কত বড় বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।
কুফরের অনিষ্ট
কুফর হচ্ছে এক ধরনের মূর্খতা, বরং, কুফরই হচ্ছে আসল ও নিখাদ মূর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে অজ্ঞ হয়ে থাকলে তার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে? এক ব্যক্তি দিন-রাত দেখেছে, সৃষ্টির এত বড় বিরাট কারখানা চলেছে, অথচ সে জানে না, কে এ কারখানার স্রষ্টা ও চালক। কে সে কারিগর, যিনি কয়লা, লোহা, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম ও আরো কয়েকটি পদার্থ মিলিয়ে অস্তিত্বে এনেছেন মানুষের মত অসংখ্য অতুলনীয় সৃষ্টিকে? মানুষ দুনিয়ার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পাচ্ছে এমন সব বস্তু ও কার্যকলাপ, যার ভিতরে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিতবিদ্যা, রসায়ন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অপূর্ব পূর্ণতার নিদর্শন, কিন্তু সে জানে না, অসাধারণ সীমাহীন জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন সে সত্তা চালিয়ে যাচ্ছেন সৃষ্টির এ সব কার্যকলাপ। ভাবা দরকার যে মানুষ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের খবরও জানে না, কি করে তার দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হবে সত্যিকার জ্ঞানের তোরণ-দ্বার? যতই চিন্তা-ভাবনা করুক, যতই অনুসন্ধান করুক-সে কোন দিকেই পাবে না সরল সঠিক নির্ভরযোগ্য পথ। কেননা তার প্রচেষ্টার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি সব স্তরেই দেখা যাবে অজ্ঞতার অন্ধকার। কুফর একটি জুলুম, বরং সব চেয়ে বড় জুলুমই হচ্ছে এ কুফর। জুলুম কাকে বলে? জুলুম হচ্ছে কোন জিনিস থেকে তার সহজাত প্রকৃতির খেলাপ কাজ জবরদস্তি করে আদায় করে নেয়া। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার যত জিনিস রয়েছে, সবই আল্লাহর ফরমানের অনুসারী এবং তাদের সহজাত প্রকৃতি (ফিতরাত) হচ্ছে ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের

আনুগত্য। মানুষের দেহ ও তার প্রত্যেকটি অংশ এ প্রকৃতির উপর জন্ম নিয়েছে। অবশ্য আল্লাহ এসব জিনিসকে পরিচালনা করবার কিছুটা স্বাধীনতা মানুষকে দিয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসের সহজাত প্রকৃতির দাবি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কুফর করছে সে তাকে লাগাচ্ছে তার প্রকৃতি বিরোধী কাজে। সে নিজের দিলের মধ্যে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রেম ও ভীতি পোষণ করবে। সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর দুনিয়ায় তার আধিপত্যের অধীন সব জিনিসকে কাজে লাগাচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অথচ তাদের প্রকৃতির দাবি হচ্ছে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর বিধান মুতাবিক কাজ আদায় করা। এমনি করে যে লোক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর, এমন কি নিজের অস্তিত্বের উপর ক্রমাগত জুলুম করে যাচ্ছে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে?
কুফর কেবল জুলুমই নয়; বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামিও বটে। ভাবা যাক, মানুষের আপন বলতে কি জিনিস আছে। নিজের মস্তিষ্ক সে নিজেই পয়দা করে নিয়েছে না আল্লাহ পয়দা করেছেন? নিজের দিল, চোখ, জিহ্বা, হাত-পা, আর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছুর স্রষ্টা সে নিজে না আল্লাহ? তার চার পাশে যত জিনিস রয়েছে, তার স্রষ্টা মানুষ না আল্লাহ? এসব জিনিস মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী করে তৈরি করা এবং মানুষকে তা কাজে লাগাবার শক্তি দান করা কি মানুষের নিজের না আল্লাহর কাজ? সকলেই বলবে, আল্লাহরই এসব জিনিস, তিনিই এগুলো পয়দা করেছেন, তিনিই সবকিছুর মালিক এবং আল্লাহর দান হিসেবেই মানুষ আধিপত্য লাভ করেছে এসব জিনিসের উপর। আসল ব্যাপার যখন এই, তখন যে লোক আল্লাহর দেয়া মস্তিষ্ক থেকে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত চিন্তা করার সুবিধা আদায় করে নেয়, তার চেয়ে বড় বিদ্রোহী আর কে? আল্লাহ তাকে চোখ, জিহ্বা, হাত-পা এবং আরো কত জিনিস দান করেছেন, তার সব কিছুই সে ব্যবহার করেছে আল্লাহর পছন্দ ও ইচ্ছা বিরোধী কাজে।
যদি কোন ভৃত্য তার মনিবের নিমক খেয়ে তার বিশ্বাসের প্রতিকুল কাজ করে, তবে তাকে সকলেই বলবে নেমকহারাম। কোন সরকারী অফিসার যদি সরকারের দেয়া ক্ষমতা সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে থাকে, তাকে বলা হবে বিদ্রোহী। যদি কোন ব্যক্তি তার উপকারী বন্ধুর সাথে প্রতারণা করে, সকলেই বিনা দ্বিধায় তাকে বলবে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার বাস্তবতা কতখানি? মানুষ মানুষকে আহার দিচ্ছে কোত্থেকে? সে তো আল্লাহরই দেয়া আহার। সরকার তার কর্মচারীদেরকে যে ক্ষমতা অর্পণ করে, সে ক্ষমতা এলো কোত্থেকে ? আল্লাহই তো তাকে রাজ্য পরিচালনার শক্তি দিয়েছেন। কোন উপকারী ব্যক্তি অপরের উপকার করছে কোত্থেকে? সবকিছুই তো আল্লাহর দান। মানুষের উপর সবচেয়ে বড় হক বাপ-মার। কিন্তু বাপ-মার অন্তরে সন্তান বাৎসল্য উৎসারিত করেছেন কে? মায়ের বুকে স্তন দান করেছেন কে? বাপের অন্তরে কে এমন মনোভাব সঞ্চার

করেছেন? যার ফলে তিনি নিজের কঠিন মেহনতের ধন সানন্দে একটা নিষ্ক্রিয় মাংসপিণ্ডের জন্য লুটিয়ে দিচ্ছেন এবং তার লালন পালনের ও শিক্ষার জন্য নিজের সময়, অর্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোরবান করে দিচ্ছেন? যে আল্লাহ মানুষের আসল কল্যাণকারী, প্রকৃত বাদশাহ, সবার বড় পরওয়ারদেগার, মানুষ যদি তাঁর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে, তাঁকে আল্লাহ বলে না মানে, তাঁর দাসত্ব অস্বীকার করে, আর তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামি আর কি হতে পারে। কখনও মনে করা যেতে পারে না যে, কুফরি করে মানুষ আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারছে। যে বাদশার সাম্রাজ্য এত বিপুল-বিরাট যে বৃহত্তম দূরবীন লাগিয়েও আমরা আজও স্থির করতে পারিনি কোথায় তার শুরু আর কোথায় শেষ। যে বাদশাহ এমন প্রবল প্রতাপশালী যে তাঁর ইশারায় আমাদের এ পৃথিবী, সূর্য, মঙ্গলগ্রহ এবং আরো কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ বলের মত চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে; যে বাদশাহ এমন অফুরন্ত সম্পদশালী যে, সারা সৃষ্টির আধিপত্যে কেউ তার অংশীদার নেই; যে বাদশাহ এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল যে সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী অথচ তিনি কারুর মুখাপেক্ষী নন, মানুষের এমন কি অস্তিত্ব আছে যে তাকে মেনে বা না মেনে সেই বাদশার কোন অনিষ্ট করবে? কুফর ও বিদ্রোহের পথ ধরে মানুষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না, বরং নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ খোলাসা করে। কুফর ও নাফারমানীর অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই যে, এর ফলে মানুষ চিরকালের জন্য ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে যায়। এ ধরনের লোক জ্ঞানের সহজ পথ কখনও পাবে না, কারণ যে জ্ঞান আপন স্রষ্টাকে জানে না, তার পক্ষে আর কোন জিনিসের সত্যিকার পরিচয় লাভ অসম্ভব। তার বুদ্ধি সর্বদা চালিত হয় বাঁকা পথ ধরে। কারণ, সে তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে গিয়ে ভুল করে, আর কোন জিনিসকে সে বুঝতে পারে না নির্ভুলভাবে। নিজের জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপে তার ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা অবধারিত। তার নীতিবোধ, কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থা, তার জীবিকা অর্জন পদ্ধতি, শাসন পরিচালন ব্যবস্থা ও রাজনীতি- এক কথায়, তার জীবনের সর্ববিধ কার্যকলাপ বিকৃতির পথে চালিত হতে বাধ্য। দুনিয়ার বুকে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, অত্যাচার উৎপীড়ন করবে, বদখেয়াল অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কৃতি দিয়ে তার নিজের জীবনকেই করে তুলবে তিক্ত-বিস্বাদ। তারপর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন আখেরাতে পৌঁছবে, তখন জীবনভর যেসব জিনিসের উপর সে জুলুম করে এসেছে, তারা তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তার মস্তিষ্ক, দিল, চোখ, তার কান, হাত-পা-এক কথায়, তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আদালতে অভিযোগ করে বলবে: এ আল্লাহদ্রোহী জালিম তার বিদ্রোহের পথে জবরদস্তি করে আমাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছে। যে দুনিয়ার বুকে সে নাফরমানির সাথে চলেছে ও বসবাস করেছে, যে জীবিকা সে অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে, যে সম্পদ সে হারাম পথে রোজগার করে হারামের পথে ব্যয় করেছে, অবাধ্যতার ভিতর দিয়ে যে সব জিনিস সে জবরদখল করেছে, যেসব জিনিস সে তার বিদ্রোহের পথে কাজে লাগিয়েছে, তার সবকিছুই

ফরিয়াদি হয়ে হাজির হবে তাঁর সামনে এবং প্রকৃত ন্যায় বিচারক আল্লাহ সেদিন মজলুমদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে বিদ্রোহীকে দেবেন অপমানকর শাস্তি।

বিশাল ঊর্ধ্ব-জগৎ ও গ্যালাক্সি

ঊর্ধ্ব-জগৎ বা মহাশূন্য সম্পর্কে আজ প্রতিটি শিক্ষিত লোকই জানে। সে এক বিশাল জগৎ। যাকে বলা হয় গ্যালাক্সি। বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছে, তা আল্লাহর সৃষ্টিজগতের তুলনায় ক্ষুদ্র একটি বালু-কণার চেয়েও নগণ্য। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস এ বিশাল গ্যালাক্সিতে এমন সব বৃহদাকার তারকারাজি রয়েছে যার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছে নি। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, এ ধরনের বৃহদাকার লক্ষ লক্ষ তারকারাজিকে গিলে ফেলতে পারে, এ ধরনের অসংখ্য কূপ রয়েছে এ গ্যালাক্সিতে। যার প্রতি আল্লাহ : তা'আলা কোরআনে ইঙ্গিত করে বলেছেন

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (الواقعة: 75-76)

আমি এ তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, নিশ্চয়ই এটা এক মহা শপথ। যদি তোমরা জানতে পার।" (সুরা ওয়াকেয়া, আয়াত: ৭৫-৭৬) সৌরজগৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সূর্যকেই নেয়া যাক। মুনিরুদ্দিন আহমাদের এর লেখা বিস্ময়কর তথ্য সংবলিত একটি গ্রন্থ প্রজন্মের প্রহসন থেকে এই উদ্ধৃতিগুলো এখানে পেশ করছি-

সূর্য একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড

সমগ্র সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই সূর্য। বলতে গেলে গোটা সৌরজগৎটা সূর্যকে কেন্দ্র করেই ঘোরা-ফিরা করে, কিন্তু আমরা যারা নিত্য এই জ্বলন্ত প্রদীপটাকে দেখি, এর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি। সকালে সূর্যের আলো দেখি, এক পর্যায়ে আবার আলোকে ডুবে যেতে দেখি, শীতের সকালে তা আমাদের আরাম দেয়। আবার গ্রীষ্মের প্রখরতায় তা থেকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করি, সব মিলে এটুকুই হচ্ছে আমাদের সাথে তার সম্পর্ক। সূর্য হচ্ছে এ বিশাল সৃষ্টিজগতের একটি সাধারণ নক্ষত্র, তার প্রখরতা ও উষ্ণতাকে কোনদিনই কোন মানবীয় জ্ঞান পরিমাপ করতে পারেনি। প্রতি সেকেন্ডে ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন এর থেকে ছিটকে পড়ছে এমন সব তারকালোকে, যার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর বুকে মানব-সভ্যতার বিকাশের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মানবকুল যতো এনার্জি ব্যয় করেছে তার চেয়ে দশগুণ বেশি এনার্জি প্রতি সেকেন্ডে সূর্য তার চারদিকে বিতরণ করে যাচ্ছে। যে গতিতে সূর্য তার হাইড্রোজেন ছড়াচ্ছে, তা একটি হাইড্রোজেন বোমার তুলনায় ১০ কোটি গুণ বেশি ক্ষমতা ও গতিসম্পন্ন। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য তার আশে-পাশে যে হিলিয়াম' নামক তরল গ্যাস তৈরি করছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ৫৬০৪ কোটি টন। এর শক্তি ও প্রখরতা এতো বেশি যে, যদি এর সামান্যতমও এই ভূমণ্ডলের কোথাও গিয়ে পড়ে, তাহলে তার ১০০ মাইলের ভেতর কোনো জীবজন্তু থাকলে তা

জ্বলে ছাই -ভস্ম হয়ে যাবে। এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে প্রতি সেকেন্ডে আর একটি জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন স্পাইকুলাস'।এই গ্যাসের গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ৬০ হাজার মাইল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, এক অদ্ভুত বিকর্ষণশক্তি তাকে মুহূর্তেই আবার সূর্যের কোলে ছুঁড়ে মারে। এই যে অকল্পনীয় ও অস্বাভাবিক জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডলী বানিয়ে রাখা হয়েছে, যার একটি অনু -পরমাণুও যদি ভূ -গোলকে সরাসরি ধাক্কা লাগে, তাহলে গোটা পৃথিবীটাই জলে -পুড়ে ছাই -ভস্ম হয়ে যাবে বলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে আলো বিতরণ করে একে ফলে -ফুলে সাজিয়ে দেয়ার এ আয়োজনটুকু করেছেন কে? কে এই মহা শক্তিধর, একে এর ধ্বংসক্রিয়ার বদলে গড়ার কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যিনি?

মানবীয় শরীর একটি ক্ষুদ্র জগৎ

মূলত: মানুষকে এ ব্যাপারে অতি সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি -ইত্যাদি ছোট ছোট মাত্র কয়েকটির খবর তারা জানে, যা সমুদ্র হতে পাখির ঠোঁটে করে উঠানো এক ফোটা পানির চেয়েও নগণ্য। আজ বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আল্লাহ তা 'আলা وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا(الإسراء: 85 - সত্যই বলেছেন তোমাদের খুব সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সুরা বনী ইসরাইল: ৮৫) বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে। বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে এবং আছে তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (সূরা যারিয়াত আয়াত ২০/২১) এখানে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও সৌরজগতের সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ভূ -পৃষ্ঠে ও ভূ -পৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তু বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের মধ্যে চিন্তা - ভাবনা করলে তোমরা এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ তা 'আলার কুদরতের এক একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক হিসাবে দেখতে পাবে। তোমরা সহজেই হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যে নিদর্শন রয়েছে, সেইসব যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে রয়েছে। এ কারণেই মানুষের। অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র একটি জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে এসে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে সে দৃষ্টির সামনে আল্লাহ তা 'আলাকে সদা উপস্থিত দেখতে পাবে। আসুন এবার তা হলে বেশি দুরে নয় একেবারেই নিজ দেহটার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়। "প্রজন্মের প্রহসন" থেকে এ প্রসঙ্গের আর একটি উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা গেল।

মানব শরীর সত্যিই এক অভূতপূর্ব মেশিন। এমন এক মেশিন যার যথার্থ বর্ণনা পেশ করা কোন দিনই কোন মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সম্ভব হবেই বা কি করে, এই শরীর তো কোন মানুষ নিজে বানায়নি যে, সে তার নিজস্ব সৃষ্টির যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব আপনাকে বলে দেবে। এই দেহের অভ্যন্তরীণ পরিশীলনের কথাই ধরুন না কেন, আমাদের হার্ট প্রতি মিনিটে ১০ পাউন্ড রক্ত সঞ্চালন করে, ব্যায়ামের সময় হার্টের এই রক্ত- সঞ্চালনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ পাউন্ডে। আমাদের শরীরে যতো রগ, শিরা- উপশিরা রয়েছে তার সবগুলোকে বাইরে এনে একটার সাথে জড়িয়ে লম্বা করতে থাকলে এর পরিমাণ হবে ৬০ হাজার মাইল। অর্থাৎ একটি মানুষের শরীরে শিরা-উপশিরা দিয়ে একজন মানুষ গোটা পৃথিবী প্রায় ৩ বার ঘুরে আসতে পারবে। সাধারণত: মানুষের শরীরে ৬ থেকে ১০ পাউন্ড রক্ত সর্বদা মওজুদ থাকে। রক্তের আবার দু,ধরনের রক্ত-কণিকা। কিছু আছে রেড সেল (লাল কণিকা) যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বহন করে। কিছু আছে হোয়াইট সেল (সাদা কণিকা) যার কাজ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোগের প্রতিরোধ করা। তা নিম্নরূপ:—
এক একজন মানুষের রক্তে রেড সেলের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি আর হোয়াইট সেল হচ্ছে আড়াই শত কোটি। অধিকাংশ হোয়াইট সেলের জীবনকাল হচ্ছে মাত্র ১২ ঘণ্টা, রেড সেলগুলো পরিমাণে একটু বেশিই বাঁচে, কোন কোন সেল ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। একজন মানুষের শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য যে শিরা বানানো হয়েছে, তার সবগুলোকে পাশাপাশি সাজালে দেড় একর জমির প্রয়োজন হবে। এর সব শিরাগুলো কিন্তু আবার একত্রে খোলা রাখা হয় না। তা হলে এক সেকেন্ডের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে সমস্ত রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে। এই শরীরের একটি অংশ যেখানে সর্বদাই রক্তের প্রয়োজন, তা হচ্ছে ফুসফুস।তার উপশিরাগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সেখানকার রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। গড়ে একজন মানুষ সারা জীবনে ৫০ কোটি বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এই যে রক্তের কথা বললাম তা কী? রক্ত হচ্ছে পনির চেয়ে ঘন একটি পদার্থ, যদিও মানুষের শরীরের ৬০ ভাগই হচ্ছে পনি। এর পরিমাণ গড়ে ১০ গ্যালন। সেই হিসেবে রক্তের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ১০ ভাগ। মানুষের শরীরে আরো বহু ধরনের উপাদান রয়েছে। যেমন মানব দেহে এতো চর্বি আছে, যা দিয়ে ৭টি বড়ো জাতের কেক বানানো যাবে। এই পরিমাণ কার্বন, আছে যে, তা দিয়ে ২৮ পাউন্ড ওজনের এক ব্যাগ কেক বানানো যাবে। এত পরিমাণ ফসফরাস আছে যে, তা দিয়ে ২২ শত ম্যাচ বনানো যাবে। এই সব মিলে মানুষ্য শরীরটা হচ্ছে এক বিচিত্র সংগ্রহ-শালা। এখানে সব কেমিক্যাল আবার একত্রে না থাকলে তাতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।
যেমন মানুষের খাবারে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োডিন না থাকে, তাহলে তার গলদেশের নিম্ন-ভাগ আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে, পরে এতে মারাত্মক ধরনের রোগ (goitr) দেখা দেবে। একটি শিশুর যখন জন্ম হয় তখন তার শরীরে হাড়ের পরিমাণ থাকে ৩০০৫টি। পরে অবশ্য এক দুটো মিশে পরিমাণ কমে তা ২০৬ এ দাঁড়ায়। ৬৫০টি পেশির

দ্বারা হাড়গুলো বেঁধে রাখা হয়। গিরার পরিমাণ একশত। পেশির সাথে যেখানে হাড়ের সম্মিলন ঘটে, তা থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী। তার প্রতি বর্গইঞ্চি পরিমাণ জায়গার উপর কমপক্ষে ৮ হাজার কেজির মতো বোঝা সহজেই চাপানো যেতে পারে। এই আশ্চর্যজনক মেশিনটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক দ্বারা, যার নাম হচ্ছে চামড়া। গড়ে একজন মানুষের শরীরে এই চামড়ার পরিমাণ হচ্ছে ২০ বর্গফুট। এর উপরিভাগে আবার রয়েছে এক কোটি লোমকূপ। আমাদের রুচিবোধের জন্য কোনটা আমরা পছন্দ করি, কোনটা আমরা অপছন্দ করি-এটা বলে দেয়ার জন্য রয়েছে ৯ হাজার ছোট সেল। এগুলোকে যথারীতি সাহায্য করার জন্য রয়েছে আরো ১ কোটি ৩০ লক্ষ নার্ভ সেল। শরীরের বাইরের বস্তুগুলোর অনুভূতির জন্য দিয়ে রাখা হয়েছে ৪০ লক্ষ বহুমুখী সেল। এগুলোই আমাদের বলে দেয় কোনটা গরম, কোনটা ঠান্ডা, কোনটাতে কষ্ট লাগে, কোনটাতে আরাম অনুভূত হয়। এসব মেশিনপত্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মানবদেহের প্রয়োজন পর্যাপ্ত জ্বালানি শক্তির। একজন স্বাস্থ্যবান লোক গোটা জীবনে ৫০ হাজার কেজি পরিমাণ খাবার সংগ্রহ করে। পানীয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১১ হাজার গ্যালন। যদি সে শহরের অধিবাসী হয়, তা হলে তার হাঁটার পরিমাণ হবে গড়ে সাত হাজার মাইল। আর যদি সে গ্রামের মানুষ হয় তা হলে তার হাঁটার পরিমাণ হবে ২৮ হাজার মাইল। এ লক্ষ-কোটি সেল, নার্ভ ও জটিল মেশিনপত্রের সমন্বয়ে তৈরি করা মানুষের শরীর। তার জন্য দুটো মূল্যবান বস্তু রয়েছে। একটি হচ্ছে এর কন্ট্রোল রুম বা নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ, আরেকটি হচ্ছে জেনারেটর বা শক্তি উৎপাদন-যন্ত্র।
ব্রেন একটি বিস্ময়কর কম্পিউটার
প্রথমে বলি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কথা। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কম্পিউটারের চেয়ে হাজার কোটি গুণ জটিল এই ছোট মেশিনটির নাম হচ্ছে ব্রেন। মাত্র তিন পাউন্ড ওজনের এ বস্তুটিকে একটি খুলির মাঝখানে এমনভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে যে, তা গোটা দেহের কোটি কোটি সেনা ও প্রহরীকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এর প্রতিটি কর্মতৎপর সেলের নাম হচ্ছে নিউরন। প্রতি সেকেন্ডে শত শত নিউরন এসে ব্রেনের প্রথম স্তরে জমা হতে থাকে। এগুলো এতো ক্ষুদ্র যে, এর কয়েক শত এক সাথে একটা আলপিনের মাথায় বসতে পারে। এগুলো হচ্ছে এক একটি ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল-যা শরীরের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং মূল নিয়ন্ত্রকের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে হাজার কোটি সেলে ছড়িয়ে দেয়। আমাদের পেছনে যে মেরুদণ্ড রয়েছে, তার মাধ্যমে তার সারা শরীরের যন্ত্রপাতিগুলোকে সজীব ও তৎপর রাখে। এর আবার স্বতন্ত্র কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। এক এক বিভাগের উপর একেক ধরনের দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন কোন অংশকে বলা হয়েছে শোনার জন্য, কোন অংশকে বলা হয়েছে বলার জন্য, কোন অংশকে বলা হয়েছে দেখার জন্য। আবার কোন অংশকে বলা হয়েছে অনুভূতিগুলোকে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল টাওয়ারে ট্রান্সমিট করে দেয়ার জন্য। সর্বশেষ এতে আবার বসানো হয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তিশালী

মেমোরি সেল। যার কাজ নিত্য নতুন সংগ্রহগুলোকে যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনের সময় তাকে রিওয়াইন করে মেমোরিগুলোকে সামনে নিয়ে আসা। এই স্মৃতি সংরক্ষণশালা প্রতি সেকেন্ডে ১০টি নতুন বস্তুকে স্থান করে দিতে পারে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বপ্রকারের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে যদি এক জায়গায় একত্র করে এ মেমোরি সেলে রাখা যায়, তাতে এর লক্ষ ভাগের এক ভাগ জায়গাও পূরণ হবে না।
ওয়েব গ্রন্থনা: আহমদ উল্লাহ মামুন /সার্বিক যত্ন: আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।

Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 3)
হার্ট একটি সূক্ষ্ম জেনারেটর
দ্বিতীয় শক্তিশালী বস্তু হচ্ছে জেনারেটর, স্বয়ংক্রিয় শক্তি উৎপাদন যন্ত্র। আমরা একে বলি হার্ট কিংবা । মানব দেহের বাম পাশে সামনের দিকে পেটের একটু উপরে এই ছোট অংশটি হচ্ছে মানবদেহের সর্বাধিক জরুরি অংশ। মানব সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এটিই সর্ব প্রথম তৈরি করা হয়েছে। তাই বলা যায় এটিই সৃষ্টির শুরু। আবার এর তৎপরতা বন্ধের মাধ্যমে মানবীয় জীবনের ঘটে অবসান। এ জেনারেটর যখন অচল হয়ে যায় তখন দেহের অন্যান্য সব কটি যন্ত্র চালু থাকলেও মূল মানুষটিকে আর জীবন্ত বলা যায় না। ভিন্নভাবে বললে, এ হার্টই হচ্ছে মানুষের জীবন। এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে এর ফলে শরীরে অন্যান্য যন্ত্রও মাঝে মাঝে তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। যেমন, শরীরের যে কোটি কোটি সেলকে বলা হয়েছে গরম-ঠান্ডা অনুভব করার কাজে তৎপর থাকার জন্য, এই মনের শক্তির কাছে তা-ও তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই মন কিংবা হৃদয়টাই হচ্ছে মানুষের আসল শক্তি। এটা ভালো তো সব ভালো, এর কথাই আসল কথা। আমরা যে দেহ নিয়ে চলি, যে চোখ দিয়ে দেখি, যে কান দিয়ে শুনি, যে মুখ দিয়ে কথা বলি তার প্রতিটি অংশই হচ্ছে এক-একটি গবেষণার সমুদ্র। চোখ দিয়ে আমরা প্রাথমিক ভাবে যা দেখি তা তো থাকে চিত্রের নেগেটিভ। কোন কুশলী আমাদের ব্রেনে এই চিত্রকে পজিটিভ করে পেশ করে? কান দিয়ে হাজার কথা একত্রে শুনি কিন্তু কে এর ভিতরে ওয়েভ-গুলোকে সুবিন্যস্ত করে রাখে? এক কথার সাথে অন্য কথার সংঘাত হয় না কেন? জিহ্বা দিয়ে যখন কথা বলি তখন তার এক লক্ষ সতের হাজার সেল একত্রে এসে কীভাবে আমার কথাগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয়? কে সেই মহান সৃষ্টি-কুশলী, মানুষ ছাড়া যিনি অন্য কোনো প্রাণীর জিহ্বায় এ সেলগুলো তৈরি করেননি?
পশু-পাখির বিজ্ঞান
আমরা এসব তথাকথিত বুদ্ধিমানদেরকে ঠিক সেভাবেই আহ্বান করছি যেভাবে আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানীদের আহ্বান করেছেন। আমরা এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় আল্লাহর একটা নিদর্শন ও বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে পারব না বলে সেদিক যাচ্ছি না। পশুপক্ষী ও মৌমাছির কথাই ধরা যাক। কে শিক্ষা দিল তাকে এ ধরনের কূটকৌশল, এ সম্পর্কে আমরা একজন বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতির অংশ-বিশেষ এখানে তুলে ধরছি। নিউইয়র্ক বিজ্ঞান একাডেমীর চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী ক্রেসী মরিসন মানুষ একাকী বাস করে না- গ্রন্থে বলেন, আপন জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনে পাখিকুলের প্রচণ্ড সহজাত ঝোঁক থাকে। তোমার ঘরের দরজার পাশেই যে চড়ুই-এর বাসা, সে শরৎকালে দক্ষিণে চলে যাবে, কিন্তু পরবর্তী বসন্তেই সে ফিরে আসবে। সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের (অর্থাৎ আমেরিকার) অধিকাংশ পাখি দক্ষিণ দিকে চলে যায়। অধিকাংশ সময় তারা সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে।

কিন্তু তারা তাদের পথ হারায় না বা ঠিকানা ভুলে না। আর পত্রবাহক পায়রা যখন কোন দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণকালে নিত্য-নতুন শব্দ শুনতে শুনতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তখন ক্ষণিকের জন্য আশ-পাশে চক্কর দেয় এবং তার পরেই সে নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে নির্ভুলভাবে পাড়ি জমায়।
প্রকৌশলী মৌমাছির সূক্ষ্ম কৌশল
গাছ-পালার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা যখন মৌমাছির পরিচিত সকল আলামত নষ্ট করে দেয়, তখনও মৌমাছি পালনে ব্যবহৃত কাঠামোতে বিভিন্ন আকারের বহু সংখ্যক কক্ষ বানায়। এগুলোর মধ্য থেকে ছোট ছোট কক্ষ সাধারণ শ্রমিকদের এবং সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে পুরুষ মৌমাছির জন্য। রানি মৌমাছি পুরুষদের জন্য নির্ধারিত কুঠরিগুলিতে অনুৎপাদনশীল ডিম পাড়ে, অথচ স্ত্রী জাতীয় শ্রমিক মৌমাছিও অপেক্ষমাণ রানি মৌমাছিদের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলোতে উৎপাদনশীল ডিম পাড়ে। আর যে সব স্ত্রী জাতীয় মৌমাছি নতুন প্রজন্মের আগমনের অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন কাটানোর পর স্ত্রীর ভূমিকায় পরিবর্তিত দায়িত্ব গ্রহণ করে, তারা শিশু মৌমাছির জন্য খাদ্য তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মধু ও তার রেণু চিবানোর অগ্রিম পরিপাকের মাধ্যমে তারা এ কাজটি সম্পন্ন করে। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছিদের বয়স বাড়ার পর এক পর্যায়ে তারা চিবানো ও অগ্রিম পরিপাকের কাজ থেকে অবসর নেয়। তারা তখন মধু ও রেণু ছাড়া আর কিছুই অন্যদের খাওয়ায় না। যে সকল স্ত্রী মৌমাছি এভাবে কাজ করে, তারা শ্রমিকে পরিণত হয়। রানি মৌমাছির কক্ষগুলিতে যেসব স্ত্রী-মৌমাছি থাকে, তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকে চিবানো ও অগ্রিম পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর এ কাজ যারা করে তারা একদিন মৌমাছিদের রানি হয়ে যায়। পরে শুধু এরাই উৎপাদনশীল ডিম পাড়ে। এই পৌনঃপুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ কক্ষ ও বিশেষ বিশেষ ডিমের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ খাদ্য পরিবর্তনের বিস্ময়কর প্রভাবেরও প্রয়োজন হয়। আর এ প্রক্রিয়া সমূহের জন্য যা অত্যাবশ্যক, তা হলো ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা, বাছ বিচার করে খাদ্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত তথ্য বাস্তবায়ন করা। এই পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে একটি সামষ্টিক জীবনে কার্যকর হয়, যা তাদের অস্তিত্বের জন্যই অপরিহার্য। এ জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যাবশ্যক, তা এ সামষ্টিক জীবন শুরু করার পর অনিবার্যভাবে অর্জিত হয়ে যায়। অথচ এই জ্ঞান ও দক্ষতা জন্মগতভাবে কোন মৌমাছির সত্তা ও তার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় খাদ্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত জ্ঞান মানুষের চেয়েও মৌমাছির বেশ। কি বিস্ময়কর পরিকল্পনা! কে এই পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ার? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠবে যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ এটা করতে পারেন। অন্য কারো দ্বারা এটা সম্ভব নয়। বোকা নাস্তিকরা বলে এটা নাকি প্রকৃতি। কিন্তু প্রশ্ন, এই প্রকৃতিটা কে তৈরি করল? এ ধরনের প্রশ্ন আর উত্তর চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত একখানেই গিয়ে শেষ হবে, তা হচ্ছে

একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন - আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন : পর্বত -গাত্রে , বৃক্ষ এবং উঁচু ডালে গৃহ তৈরি কর , এরপর সর্বপ্রকার ফল মূল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে নিঃসৃত হয় নানাবিধ পানীয় , তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার , নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সুরা নহল , আয়াত: ৬৯)

মধুর মধ্যে নিহিত প্রকাশ্য ও গোপন সত

মধু সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বাণীতে বলা হয়েছ :

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 67

মানুষের জন্য আরোগ্য। (সুরা নহল : ৬৯) এখানে আল্লাহপাক আরোগ্যের কথা বলেছেন কিন্তু কোন বিশেষ অসুখের নাম নেননি। অতএব এর ব্যাপ্তি বিশাল। এর ক্ষেত্র সীমিত নয়। অসীম। বরং মানুষের যাবতীয় ব্যাধি বলতে শারীরিক , মানসিক , আত্মিক -সবই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ মানুষ একাধারে বস্তু ও আত্মার সমষ্টি। আর এ জন্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা 'আলা এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যত প্রকারের অসুখ মানুষের হোক না কেন , তার সূচনা হয় তার মন বা আত্মা থেকে এবং তার পরিণতি বা প্রতিক্রিয়ায় দেহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এখন আসুন , আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি অনুযায়ী মধুর মধ্যে নিহিত মূল রহস্য সম্পর্কে বুঝতে গিয়ে , তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে , দেখি। "সকল মানুষের মানুষের জন্য আরোগ্য - এ কথাটি দ্বারা আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন : মধু মানুষের অন্তরাত্মা , জীবন এবং শরীরের জন্য আরোগ্য বা নিরাময় দানকারী। কিন্তু কীভাবে ? এ প্রসঙ্গে মধুর সৃষ্টি এবং মৌচাকে যে নির্মাণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা বুঝার জন্য নিজেদের চিন্তাশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ তাআলা মৌমাছির নিকট এলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন - খাও সকল ফলমূল থেকে ।

অর্থাৎ , সকল প্রকার ফলের নির্যাস থেকে খাও এবং সেই সব নির্যাসের মধ্যে নিরাময়কারী সুধা তোমাদের পেটের কারখানাতে রেখে তাকে শক্তিশালী কর। আল্লাহ তা 'আলার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে ঐ আহরিত নির্যাস অবশেষে মানবমণ্ডলীর ব্যাধি সমূহের জন্য পরম আরোগ্য দানকারী মধুতে পরিণত হয়। ফুলের রস , পাতা এবং বৃক্ষ ছাল ও মূল থেকে মধু হয় না। এই সঞ্জীবনী সুধার জন্য বিশ্ব -সম্রাটের নির্দেশে বিশেষ বিশেষ উপাদান সমন্বয়ে প্রক্রিয়াকরণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। আর এ জন্যই এই সুধার মাঝে কোন ভেজাল , ভ্রান্তি বা ত্রুটির কোন সম্ভাবনা নেই। একটু চিন্তা করে দেখুন , পৃথিবীর সকল চিকিৎসাবিদ একত্রিত হয়ে কোন রোগীর জন্য যদি কোন ওষুধ নির্বাচন করে , তবু তারা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবে না যে ঐ ওষুধ শতকরা একশত ভাগ কার্যকরী হবে , অথবা ঐ ঔষধের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। আজকের

উন্নত বিশ্বের ডাক্তারগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছেন বলে দাবি করেন, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এক রোগের ওষুধ হয়তো ঐ রোগকে উপশম করছে, কিন্তু তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আরও বহু অসুখের জন্ম দিচ্ছে। অথচ মধু সম্পর্কে সবজান্তা ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন-“মানবমণ্ডলীর জন্য আরোগ্য”। যেমন সবাই জানেন, মৌমাছিরা সর্বপ্রকার সবুজ বৃক্ষের ফুলের খুশবু এবং ওইসব গাছ-গাছালির মধ্যে নিহিত জীবনী শক্তিসমূহ ভক্ষণ করে নিজেদের পেটের মধ্যে এক বিশেষ স্থানে লালা তৈরি করে, আর তাকেই আমরা মধু বলি। সুতরাং, বুঝা গেল সর্বপ্রকার ফল ফুল এবং ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে উৎপন্ন পত্রপল্লবের স্বাদ ও গন্ধ সমন্বয়ে-স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার অদৃশ্য তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় এই মহামূল্যবান পানীয়। এসব গাছপালা, ফল ও ফুলের মধ্যে অবস্থিত খুশবু ও স্বাদের সঠিক উপকারিতা বা তাৎপর্য খুব কম মানুষই জানে বা চিন্তা করে। এজন্য যারা মধু সেবন করে তাদের আত্মা ও মেধা- মননের গভীরে মধু প্রভাব বিস্তার করে। তারপর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রতিটি লোমকূপে। অত:পর আত্মা ও অবয়বে মধু ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত পবিত্র প্রাণশক্তি সর্বাগ্রে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং ঐ বিশুদ্ধ রক্তের প্রবাহ ছড়িয়ে দেয় সকল ধমনিতে, ফলে পবিত্রতার এ অমিত তেজ এবং অদৃশ্য অমোঘ শক্তি উদ্দীপ্ত করে অকল্পনীয়ভাবে এবং মুক্ত করে তাকে বহু জটিল রোগ ব্যাধি থেকে। আল্লাহপাক পাক কোরআনে মধুর বিভিন্ন রঙের উল্লেখ করেছেন।
এইভাবে রং মানুষের জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগে। আমাদের মন মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা করার জন্য যে কোষগুলি কাজ করে সেগুলির উপর সৃষ্টি জগৎ এবং তার বাহির থেকে আগত জ্যোতি এবং নুরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রং এবং মধুর উজ্জ্বলতার মধ্যে রয়েছে আরোগ্য দান করার জন্য সর্বপ্রধান ভূমিকা; তাই এরশাদ হচ্ছে-এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রং, (যা) আরোগ্য মানবমণ্ডলীর জন্য।”(সুরা নহল: ৬৯) সেই বিখ্যাত লেখক মি. ক্রেসী মরিসন তাঁর গ্রন্থে আরো যেসব উদাহরণ পেশ করেছেন তার মধ্যে কুকুরের অনুসন্ধানী নাক সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। অথচ মানুষ আজ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি, যা তার নিজের দুর্বল ঘ্রাণশক্তিকে তীব্রতর করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, জলজ মাকড়সা নিজস্ব জাল দিয়ে নিজের জন্য বেলুন আকৃতির যে বাসা তৈরি করে থাকে, তা মানুষের চিন্তা-শক্তিরও অনেক ঊর্ধ্বে।
সলোমান মাছ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, কীভাবে বছরের পর বছর সমুদ্রে কাটাবার পর এই মাছ তার জন্মস্থান নদীতে ফিরে আসে। তার চেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা এ লেখক উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে জলজ সাপের বিস্ময়কর সফর। এ সাপের স্বভাব ঠিক সলোমান মাছের বিপরীত। এই প্রাণীটি বয়স হলেই নিজ পুকুর, নদী, খাল-বিল হতে হিজরত করে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে চলে যায়। এই

ধরনের আরো অনেক তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থকে একটি বিস্ময়কর গ্রন্থে পরিণত করেছেন। সত্যিই মহান আল্লাহর এই কুদরতি, সৃষ্টি-কুশলতা ও কারিগরি নৈপুণ্য তাঁর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে মানুষের বিবেককে বাধ্য করে।
রেশম বা তুঁত পোকা
তাহলে বল, তোমাদের প্রভুর কোনসে নেয়ামত তোমরা অস্বীকার করবে ? (সুরা আর রাহমান) আল্লাহ তাআলার অগণিত নেয়ামতের মধ্যে রেশম বা তুঁত পোকা এক উত্তম নেয়ামত। রেশম পোকা, তার নিজেরই দেহ নিঃসৃত আঠা দ্বারা কত মজবুত, মোলায়েম মসৃণ ও সুন্দর সোনালি রঙের সুতা তৈরি করে, যা চিন্তা করলে হয়রান হতে হয়। অথচ মানুষ ঐ সুতা লাভ করার জন্য কত নির্দয়ভাবে সেই পোকা হত্যা করে। সেই সুতা দিয়ে মূল্যবান কাপড় তৈরি করে ব্যবসা করে এবং অর্থ রোজগার করে। নিষ্পাপ এই ক্ষুদ্র কীটটি মানুষের জন্য মূল্যবান সুতা সরবরাহ করা ছাড়া জ্ঞান ও কৌশলগত কত শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরে, সচরাচর কেউ হিসাব করে না। সুতা বানাতে গিয়ে তাকে পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, আর সেই বুদ্ধি হিকমতের পিছনে কোন সে মহান কুশলীর অদৃশ্য হাত কাজ করে, তা অপরিণামদর্শী লঘুচেতা ও ভাসা ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাব করে না। যদি ঐ কীটের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানুষ চিন্তা করত, তাহলে সে তার মনযিলে মকসুদ, অর্থাৎ আখেরাতের জিন্দিগির রহস্য বুঝতে পারতো, অনুধাবন করতে পারতো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন হাদিসের মাধ্যমে প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির তাৎপর্য ও উপকারিতা। সর্বোপরি জানতে পারতো সবকিছুর পিছনে দয়াময় পরওয়ারদেগারের জ্ঞান, ইচ্ছা ও হিকমত প্রচ্ছন্ন থাকার কথা এবং এর ফলে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত তার ঈমান ও সত্যপথে টিকে থাকার অবিচলতা। এবার আমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখি ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ইলহামী জ্ঞানের দিকে। মহান রব্বুল ইজ্জতের অদৃশ্য ইশারাতে ঐ পোকা খায় আঠাযুক্ত পত্রপল্লব, যেমন কুল বা বরই পাতা, তুঁত-পাতা ইত্যাদি। এসব আঠাযুক্ত পাতা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থিত আরও কিছু উপাদানের সংমিশ্রণে এই মূল্যবান সুতা তৈরি হয় এবং তাকে জীবন সঞ্জীবনী নেয়ামতের অধিকারী বানায়। এইভাবে প্রকাশ পায় তার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের করুণারাশির ঝরনাধারা। রেশম-কীট জন্ম-লগ্নে ছোট একটি পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র থাকে এবং ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে, বসন্ত সমাগমের সাথে সাথে দিবালোকে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে গাছে গাছে দেখা দেয় পত্রপল্লবের কুঁড়ি ও কচি-কচি মনোরম পাতা। রেশম কীটের এই বাচ্চাগুলি ঐ তুলতুলে পাতাগুলি খেতে খেতে দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে এবং শীঘ্রই পূর্ণ পোকায় পরিণত হয়। তারপর রাব্বুল আলামিনের অদৃশ্য ইশারায় নিরাপদ বাসস্থান লাভের আশায় ঘর তৈরির দিকে তারা পারপূর্ণ মনোযোগ দেয়। সে ঘর এমনই সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত এবং এত সুন্দর যে, দেখলে মনে হয়-এ ঘরের পূর্ণ ছবি তার নিজের মধ্যে খোদিত ছিল এবং সেটাই এখন বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এভাবে ঘরগুলি নজরে পড়তে থাকে। এসব ঘরের

মধ্যে তারা আরামে শুয়ে পড়ে এবং মুখ নিঃসৃত আঠা দ্বারা প্রস্তুত সূক্ষ্ম সুতার বেষ্টনী দিয়ে ঘরের আচ্ছাদন বাড়াতে থাকে। ঘরের একটি অংশ হাওয়া বা অক্সিজেন প্রবেশের জন্য খোলা রাখে। কবুতরের ডিমের মত ঘরের প্রস্তুতিকাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে ক্লান্ত-শ্রান্ত কীটগুলি পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে শুয়ে পড়ে। এরপর শীত মৌসুমের আগমনে কীটগুলি নিজ নিজ ঘরের মধ্যেই অদৃশ্য জগতের উদ্দেশ্যে উধাও হয়ে যায়। কী মজার ব্যাপার! ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখ পড়ার সাথে সাথে, হঠাৎ করে দেখা যায়, পোকাগুলি নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং তাদের বাচ্চাদেরকে ডিম থেকে বের করে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দিচ্ছে। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন, শীত আসছে-কে পূর্বাহ্নে তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয় যে জন্য তারা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে তড়িঘড়ি ঘর বানাতে শুরু করে। এবং এত চমৎকার ও মজবুত কেল্লার মত ঘর বানাতে তাদেরকে কে শেখায়! কে তাদের কে তিনটি মাস ধরে অভুক্ত অবস্থায় বাইরের আলো বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখে! কে দেয় তাদেরকে এ জ্ঞান বুদ্ধি ও হিকমত! আবার ফেব্রুয়ারি মাস আসার সাথে সাথে কে তাদেরকে ঐ গভীর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে কর্মতৎপর করে তোলে! আসুন, ঊর্ধ্বলোকে সফরের সাথি ভাইয়েরা, এই রেশম কীটদের প্রদত্ত গায়েবি জ্ঞান সম্পর্কে একবার চিন্তা করুন এবং ভাবুন, কে নিয়ন্ত্রণ করছে আপনাকে, আমাকে, সবাইকে এবং দুনিয়ার সকল সৃষ্টিসমূহকে।
ওয়েব গ্রন্থনা: আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার /সার্বিক যত্ন: আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।

Avjvn ZvAvjvi cwiPq (ce© : 4)
মুরগি ও ডিমের বিস্ময়কর রহস্য

সৃষ্টির অগণিত রহস্যের মধ্যে আমাদের গৃহপালিত পক্ষীকুলের একটি হল মোরগ মুরগি। তাকিয়ে দেখুন তাদের জন্ম রহস্য এবং চলাফেরার মধ্যে কত আশ্চর্যজনক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিষয় রয়েছে। মোরগ-মুরগি ভোর বেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সন্ধানে আবর্জনার স্তূপের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তারা পছন্দ ও রুচি-মত খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকে। তাদের বিচিত্র পছন্দ থেকে পোকামাকড়, সাপের বাচ্চা, বিচ্ছু, কীটপতঙ্গ,ঘাস, ফল-ফুল, কাচ পাথর বালি সোনা- চাঁদি-কিছুই বাদ পড়ে না। তাদের পাকস্থলী আল্লাহ তা‘আলার নির্মিত এমনই এক অভিনব কারখানা যেখানে পড়ার সাথে সাথে সকল কিছু হজম বা আত্মস্থ হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় উপাদান তাদের শরীরে পৌঁছে যাওয়ার পর বর্জ্য-পদার্থ মল আকারে বেরিয়ে যায়। এমন পাকস্থলী বাঘ-ভল্লুক হাতি-ঘোড়া, এমনকি মানুষেরও নেই, যেখানে লোহা-কাচ পাথর, শাক-সবজি, ঘাস-পাতা, তরিতরকারি, গোশত, মাছ-সবকিছুই হজম হয়ে যায়। যা তার শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয়, রাব্বুল আলামিন তার মধ্যে এমন বীজ রেখে দিয়েছেন, যার ফলে এমনি আরো মুরগি পয়দা হবে এবং দুনিয়ায় তাদের বংশ বিস্তার হতে থাকবে। এইভাবে, প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাব যে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত জীব-জন্তু ও পক্ষীকুলকে আল্লাহ তা‘আলা ভিন্ন ধরনের ওহি বা ইলহাম দ্বারা তাদের কার্যক্রম ও খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করছেন। রাব্বুল আলামিনের ইলহামী ইশারাতে মুরগি জমিনের অভ্যন্তরে ও উপরিভাগের অসংখ্য জিনিস থেকে ডিম দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু যখন ডিম দেয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহপাক তাকে গোপন ওহির মাধ্যমে নির্দেশ দেন: এখন তার এতসব খাদ্য দরকার নেই, এতদিন ডিমের খোলস শক্ত বানানোর জন্য নানাবিধ খাদ্যসহ ওইসব ধাতব দ্রব্য প্রয়োজন ছিল। এখন ডিম দেয়া বন্ধ, কাজেই ঐগুলি আর খেয়ো না এবং প্রজননের জন্য এখন নর ও মাদির মিলনের দরকার নেই। এবার একুশ দিনের জন্য বসে যাও, ডিমগুলি তা দিতে থাক। এ জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে যতটুকু প্রয়োজন আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে ততটুকু খাদ্য গ্রহণের জন্য দিনে একবার বের হবে। কতটুকু তাপ কত সময় ধরে দিতে হবে সে বিষয়েও তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়। তাই সে প্রথম সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বেরিয়ে কিছু খাবার খেয়ে আবার গিয়ে বসে। দ্বিতীয় সপ্তাহে তার বের হওয়ার সময় আরও কমিয়ে দেওয়া হয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে তাপ আরও দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার প্রয়োজনে ডিম থেকে উঠে আসা আরও কমিয়ে দেয়া হয়। শুধু যে ডিমের তাপ সংরক্ষিত রাখার জন্য তার বসে থাকতে হয়, তা নয়, বরং ডিমগুলি মাঝে মাঝে নাড়তে হয়। নেড়েচেড়ে তার সকল দিকের পরিচর্যা সুসমঞ্জসভাবে করা লাগে। এ বিষয়েও তাকে গায়েবি নির্দেশ দেয়া হয়। একুশ দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ডিমের মধ্যে

বাচ্চার গঠন যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন গায়েবি নির্দেশ আসে: এখন আর ডিম নাড়াচাড়া নয়, এখন দুনিয়ার জীবনে পদার্পণ করার জন্য বাচ্চা প্রস্তুত, তার দেহ অত্যন্ত নাজুক; অতএব সে নিজে নিজে চেষ্টা করে শক্ত খোলটি ভেঙে ফেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। সুতরাং সবর করতে হবে, যখন তার কানে হালকা হালকা মনোরম আওয়াজ আসতে থাকে। এ সময়ে বাচ্চাকে দেখার জন্য মুরগিটি অস্থির হয়ে উঠে। এজন্য সে ডিমের উপর বার বার ঠোকর দিতে থাকে। তখন তাকে সতর্ক করার জন্য তার কানে গায়েবি শব্দ বেসে আসে: হে নাদান মুরগি, তোর সামান্য ভুলের কারণে ডিমের মধ্যে এতদিন ধরে লালিত বাচ্চাটি মারা যেতে পারে। তুই যদি তোর চঞ্চু দিয়ে ঠোকর মেরে বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি বের করার চেষ্টা করিস সেই আঘাত বা চাপে বাচ্চাটা মারা যেতে পারে। সুতরাং মুরগির কর্তব্য হচ্ছে, বাচ্চা নিজে নিজেই খোল ভেঙে বেরিয়ে আসুক-তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকা। গায়েবের জগতে আল্লাহ তা‘আলার প্রতিপালন, রহমত এবং হেদায়েত দানের কাজ একই সাথে চলছে। এখন আসুন, আমরা বুঝতে চেষ্টা করি কেমন করে অদৃশ্য জগৎ থেকে কীভাবে ডিমের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব হয়। অতি দুর্বল নবজাতক মুরগি বা মুরগির বাচ্চা কঠিন একটি পরদা ও তার উপরের শক্ত খোলের মধ্যে কীভাবে প্রাণ পেল, কীভাবে বন্দী জীবন যাপন করল, কীভাবে পেল পরদা ও খোলের জিন্দানখানা ভেঙে দুনিয়াতে আসার সামর্থ্য! যে পরদা ও খোলের মধ্যে এতদিন সে বাস করল, সেখানে না ছিল চোখ খোলার কোন উপায়, না বাহু বা পাখনা মেলার জায়গা। সেখানে সে না পা বিস্তার করতে পারে, আর না বাহ্যিক জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠে যার ফলে বাইরের কোন সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব। এ সময় তার মালিক, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা দয়াময় আল্লাহ তা‘আলাই তার একমাত্র সাহায্যকারী এবং ত্রাণকর্তা, আর অবশ্যই তার জীবনশিরা বা থেকেও তিনি তার সন্নিকটে। ঐ রহস্যময় অজানা-অচেনা গভীর অন্ধকার জগৎ থেকে দিকনির্দেশনা আসে ডিমের খোলের মধ্যে আগত নবীন ঐ বাচ্চাটির জন্য এবং তখন সে তার ছোট্ট মোলায়েম ঠোঁট বা চঞ্চু দিয়ে ঠোকর মেরে মেরে পরদার স্তরগুলি ছিঁড়ে ফেলতে থাকে এবং পরিশেষে বাহিরের শক্ত খোলটি ভেঙে সে বাহিরে আসার পথ করে নেয়। ঠিক মুহূর্তে কীভাবে সে পথ করে নেবে, তা তাকে জানানো হতে থাকে কুল মখলুকাতের মালিকের পক্ষ থেকে। যাঁর একক নিয়ন্ত্রণে সবকিছু চলছে ও সংঘটিত হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ডিমের মধ্যে রক্ষিত বিভিন্ন স্তর ও আকৃতি উদ্দেশ্যবিহীন নয়। লাটিমের মত এই গোলকটির নীচের দিকে থাকে একটি কালো ক্ষুদ্র গোলক। এই কালো বিন্দুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তার মাথা এবং উপরের মোটা অংশটিতে ধড়। এভাবে আরও বিভিন্ন স্তরে তার পাখনা, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী ইত্যাদির গঠন হতে থাকে মালিকের ইচ্ছা মত। এসব কিছুর পরিচর্যার জন্য সে ব্যবস্থা নিতে থাকে।
ডিমের সরু অংশ যেখানে ছোট্ট গোলকটি উৎপন্ন হয়ে মাথা তৈরির কাজ করে, ঠোকর মেরে খোলসটি ভাঙ্গার কাজ কিন্তু ওখান থেকে হয় না। কারণ ঐ অংশটি থাকে অপেক্ষাকৃত ছোট ও শক্ত। ওখান থেকে

মাথা বের হতে পারলেও বড় ধড়টি বের হওয়া মুশকিল। এজন্য খোলটির সাথে সংলগ্ন উপরের ঝিল্লির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাচ্চাটিকে ঘুরতে হয় এবং এটা রাব্বুল আলামিনের নির্দেশেই সে করে। তবে, গম্বুজের মত মোটা অংশের দিকে ঘুরে সে ঠোকরাতে থাকে না। এ পদ্ধতি তার বাহিরে বেরিয়ে আসার পথ সুগম না হয়ে তার মৃত্যু ডেকে আনবে। যেহেতু মোটা অংশে থাকে অক্সিজেন ট্যাংক, এজন্য তাকে পাশে ঠোকর দিয়ে বেরোনোর পথ করে নিতে হয়। একটু খেয়াল করলেই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ব্যবস্থাপনা ও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বুঝতে পারব। নরম তুলতুলে ঐ মুরগির বাচ্চাটির শরীরে কোন প্রকার চাপ বা আঁচড় না লাগে তার জন্য তাকে তিনি এলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন: ধীরে ধীরে ঠোকর দিয়ে খোলটির এমনভাবে দাগ করে দাও যেন খোলটি দুর্বল হয়ে দু‘ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তুমি আসানীতে দুনিয়ার আলোতে বেরিয়ে আসতে পার। কে তাকে এই সুনিপুণভাবে ডিমের গায়ে দাগ লাগিয়ে দেয়ার কৌশল ও টেকনিক শেখাল? এসব আর কিছু নয়, প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়ের উপর আল্লাহ তা‘আলার নিয়ন্ত্রণ ও হেদায়েত বা ওহির মাধ্যমে পরিচালনার ফল যা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকালে বুঝা যাবে না।
মাকড়সা
সকল গৃহের মধ্যে যে ঘরটি সব থেকে সূক্ষ্ম এবং নরম তা হচ্ছে মাকড়সা নির্মিত ঘর। মাকড়সা নিজেও অত্যন্ত নাজুক। এদেরকে রক্তপায়ী প্রাণী-যেমন বিচ্ছু ইত্যাদির বংশোদ্ভুত মনে করা হয়। এরা দুরন্ত অনুভূতিশীল এবং অত্যন্ত মেধাবী বা স্মরণ শক্তিসম্পন্ন প্রাণী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এক আশ্চর্যজনক জ্ঞান দিয়েছেন। তাদের ঘর তৈরির সকল সরঞ্জাম বা উপাদান তারা তাদের নিজেদের শরীর থেকেই পেয়ে থাকে। বাইরের মাটি পাথর ঘাস পানি ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না এবং তারা নিজেরাই এর নির্মাতা। তাদের নিজেদের অস্তিত্ব থেকে সংগৃহীত নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা তৈরি এ ঘরই তাদের একমাত্র নিরাপদ বাসস্থল এবং এই ঘর থেকেই তারা তাদের জীবন ধারণ সামগ্রী লাভ করে। এ ঘরের সুন্দর জালে ধরা পড়ে পোকা মাকড়, মশা- মাছি এবং ছোট ছোট পাখি তাদের খোরাকে পরিণত হয়। আজব এ পোকার জ্ঞান, অদ্ভুত তার বাসগৃহ, আশ্চর্যজনক তার বুনন পদ্ধতি, এ ঘরের দেয়াল ও দরজা বিস্ময়কর, তাঁর জীবনটাও বড় চমকপ্রদ, মৃত্যুও ততোধিক বিচিত্র। মাকড়সা যখন গর্ভবতী হয় তখন গাছের খোল অথবা পাথরের ফোকরের মধ্যে স্থান গ্রহণ করে। তার পেট থেকে ডিম বের হওয়া থেকে নিয়ে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সে বসে থাকে এবং বাচ্চারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই তারা মাকে খাওয়া শুরু করে দেয় এবং শক্তিশালী হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসব পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলতে ইচ্ছা হয়। ‘হে সকল বিস্ময়কর ও অজানা বিষয়ের প্রকাশক, অবশ্যই আপনি সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়’।
একটি সিজদা হাজার গোলামি থেকে মুক্তি

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মূলত: আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা ইতিহাসের কোন যুগেই ছিল না। নবী রাসূলগণ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করানোর উদ্দেশ্যে এ পৃথিবীতে আসেন নি। কাফেরদের যখন জিজ্ঞাসা করা হতো যে, এ চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলতো, আল্লাহ। নবী রাসূলগণ এসেছেন আল্লাহকে আড়াল করে সমাজে যে সমস্ত কুসংস্কারের জন্ম হয়েছিল, তা দূর করার জন্য। আল্লাহর গুনাবলী, তাঁর পবিত্র নাম, অন্য কথায় তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির প্রতি মানুষকে আহ্বান করার জন্যই তাঁরা পৃথিবীতে এসেছিলেন। আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তাঁর সৃষ্টি- নৈপুণ্যে অন্য কারো বিন্দুমাত্রও অংশীদারিত্ব নেই। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একমাত্র মালিকানার দাবি করতে পারেন। যিনি রিজিক দান করেন, তিনিই আনুগত্য চাইতে পারেন। যিনি প্রতি মুহূর্তে আলো-বাতাস আর পানি-অক্সিজেন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিপালন করে যাচ্ছেন এবং আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন-মাথা শুধু তাঁর সামনে অবনত হতে পারে। অন্য সব মিথ্যা ক্ষমতা আর অসত্য গুণের দাবিদারকে অস্বীকার করে সর্বময় ক্ষমতার প্রকৃত মালিককে স্বীকার করানোর জন্যই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলগণ এসেছেন। আর তাঁরা যা নিয়ে এসেছেন, আর নামই হলো ইসলাম। প্রকৃত মালিকের আনুগত্যের স্বীকৃতি। আর এ আনুগত্যের মাধ্যমেই আসে ইহকাল ও পরকালের শান্তি। এটাই হচ্ছে ইসলামের অর্থ! মূলত: একমাত্র মালিকের আনুগত্য স্বীকার করার মধ্যে বান্দার প্রকৃত আজাদি রয়েছে। এ একটি সত্তার আনুগত্য স্বীকার করলে তাকে অসংখ্য শক্তির সম্মুখে মাথা নত করতে হয় না। আর এটাই সমস্ত কথার মূলকথা। এই কথাকেই ড. ইকবাল তাঁর কবিতায় এভাবে বলেছেন-
সে হলো একটি সিজদা-
যাকে তুমি বোঝা মনে কর,
প্রকৃতপক্ষে সে সিজদাই তোমাকে
আরো হাজার সিজদা থেকে নিষ্কৃতি দেয়।
ডিএনএ সংক্রান্ত জ্ঞান
চিকিৎসা বিজ্ঞানে নজিরবিহীন অগ্রগতি এনে দিয়েছে ক্ষুধা দারিদ্র্য অজ্ঞতা এবং রোগব্যাধি মানুষের চিরন্তন শত্রু। মানুষ সবসময় এর যন্ত্রণা ও পীড়া থেকে মুক্তির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এখনও মানুষের অনেক কিছু অর্জনের বাকি রয়েছে। সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসাবে ডিএনএ সংক্রান্ত পরিষ্কার ধারণা আমাদের সম্মুখে এসে গেছে। এর ফলে মানসিক রোগ, , বহুমূত্র, হুপিংকাশি, মাদকাসক্তি এবং আরো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সহজ হয়ে গেছে। এখন এর মাধ্যমে অঙ্গ বিকৃতি ব্যাধি সমূহের প্রতিরোধ সম্ভব হয়ে উঠবে। সত্যি বলতে কি একুশ শতক জিন থেরাপী যুগের সূচনা করেছে।
ধর্ম-বিমুখতা ও এইডসের আজাব

আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও ধর্ম-বিমুখতার কারণে বর্তমান বিশ্বে অবাধ যৌনাচার তীব্র হয়ে উঠেছে। এমনকি সম-মৈথুনও ব্যাপকতর হচ্ছে। কোন কোন নবীর যুগেও তার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম-মৈথুনের প্রচলন ছিল। এই অপবিত্র অপকর্ম পরিহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে সতর্ক-বাণীও উচ্চারিত হয়েছিল। আল্লাহর শাস্তি হিসাবে লুতের জনগোষ্ঠীর অনিবার্য ধ্বংসের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই জনগোষ্ঠী সব ধরনের সতর্ক-বাণীকে অগ্রাহ্য করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি গন্ধক ও অগ্নি বৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে পুরো জনগোষ্ঠী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইসব অপকর্মের শাস্তি হিসাবে গত কয়েক শতাব্দী ধরে সিফিলিস ও গনোরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। বর্তমানে মানব হন্তা নতুন রোগ এইডস বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এ রোগ অবাধ যৌনাচারের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে থাকে। এ জন্য এ থেকে নিষ্কৃতির পথ হল পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করা।
এ যুগের নাস্তিক বনাম জাহেলী যুগের কাফির
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগের বড় বড় কাফির আবু জাহেল, আবু লাহাবও আল্লাহর অস্তিত্বকে কোনদিন অস্বীকার করে নি। তারা অস্বীকার করত শুধু তাঁর গুণাবলি ও সর্বময় ক্ষমতার একক অধিকারকে। অন্ধকার যুগ বলে আমরা যাকে আখ্যায়িত করি, সে যুগের লোকেরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্মের পূর্বে আবরাহা বাদশা যখন কাবা-ঘর ধ্বংস করতে আসল এবং তার সৈন্যরা কোরাইশ সম্প্রদায়ের কিছু উট ছিনিয়ে নিল। এ উটের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কিছু উটও ছিল, তিনি আবরাহার দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার লোকজন আমার উট ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে, আমি তা ফেরত চাই। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমরা কা’বাঘর ধ্বংস করতে এসেছি, সে ব্যাপারে কোন কথা না বলে আপনি সাধারণ উটের কথা বললেন। আব্দুল মুত্তালিব উত্তরে বললেন, আমি উটের মালিক, আমি উট চাই, কা’বাঘরের একজন মালিক আছেন, তিনিই এটা রক্ষা করবেন। কাজেই, এখান থেকে বুঝা যায়, জাহেলিয়াতের যুগেও লোকেরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। তারা হজ ও উমরা পালন করত। এর সাথে সাথে তারা দেব-দেবীরও পূজা করত।
ইতিহাসের এক পর্যায়ে সত্য-মিথ্যার ফয়সালা হয়েছিল বদরের ময়দানে, সেখানে আরবের শক্তিধর সেনাপতি আবু জাহেল বদরের ময়দানের দিকে রওনার পূর্ব ক্ষণে কা’বাঘরের গিলাফ ধরে বলল, হে ঘরের মালিক, আমাদের দ্বীন যদি সত্য হয়, তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মুসলিম বাহিনী নিয়ে বদরের ময়দানে আসছে, তার একজনও যেন জিন্দা অবস্থায় ফিরে যেতে না পারে। আমরা যেন তাদেরকে ধরাশায়ী করতে পারি। আর যদি মুহাম্মদের দ্বীন সত্য হয়, তাহলে আমরা আরবের সর্দার ৭০ জনের একজনও যেন জিন্দা অবস্থায় ফিরে না আসি। আল্লাহ তা‘আলা আবু জাহেলের দোয়া কবুল করলেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُـوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَـذَابِهَا
كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَـالِحًا غَيْـرَ الَّذِي
كُنَّا نَعْمَـلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَـا يَتَـذَكَّرُ فِيـهِ مَنْ تَـذَكَّرَ وَجَـاءَكُمُ النَّذِيرُ فَـذُوقُوا فَمَـا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (فاطر: 36-37

[illegible]

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (البقرة: 163

[illegible]

[illegible]

[illegible]